৫ম সেমেস্টার: উপন্যাস পাঠ

জয়া গোয়ালার ‘তবুও মাদল বাজে’: উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু সারসংক্ষেপ (প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ)

ড. দীপঙ্কর দেবনাথ (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়)

তবুও মাদল বাজে উপন্যাসটির পটভূমি ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের তিনটাঙা নামের এক পাহাড়ি-জঙ্গলবেষ্টিত জনপদ। সাঁওতাল, মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে। বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি এই অঞ্চলটি। টিলা, ঘন জঙ্গল, ঝরনা, নদী আর দাওধারানি নামের সাপ্তাহিক হাটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনজীবনই উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করেছে। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র ডমরু এক দরিদ্র তরুণ যার চোখ দিয়ে পাঠক প্রত্যক্ষ করে এই জনপদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, সম্পর্ক, কুসংস্কার, সহিংসতা ও ভালোবাসার জটিল বুনন। উপন্যাসটি মূলত একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব-সংকটের আখ্যান। দারিদ্র্য, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, ডাইনী হত্যার মতো নিষ্ঠুর কুসংস্কার, প্রেম, কামনা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক একসঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে এই আখ্যানে। তিনটাঙা একটি পুরনো গ্রাম, যেখানকার মানুষ মূলত কাঠ-বাঁশ সংগ্রহ করে। জঙ্গল থেকে সামান্য ফসল ফলিয়ে আর দাওধারানির হাটে টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করে জীবনযাপন করে। গ্রামের ভৌগোলিক বর্ণনায় বারবার উঠে এসেছে টিলা, শ্মশান-কবরস্থান, ঝরনা, বাঁশবন আর সাপ-খোপ পূর্ণ জঙ্গলের দৃশ্য। এই জনপদের মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র। খাদ্যাভাব, রোগবালাই, আর মহাজনি শোষণ তাদের নিত্যসঙ্গী। পাশাপাশি এই অঞ্চলে মাঝে মাঝেই সেনাবাহিনীর আনাগোনা হয়। যারা সন্দেহভাজন কাউকে ধরে নিয়ে যায় বা গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে যায়। ফলে জঙ্গল ও পাহাড় শুধু জীবিকার উৎস নয় রাজনৈতিক সহিংসতারও ময়দান হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডমরু—তরুণ, পরিশ্রমী, দরিদ্র, যে বাঁশ-কাঠ কেটে, টুকটাক কাজ করে সংসার চালায়। তার ছোট বোন শাওনি। ভাইয়ের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত এবং সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব বহন করে। ডমরুর দুই সন্তান (সুনু ও মুনু) তার স্নেহের কেন্দ্রবিন্দু। ডমরুর খুড়তুতো ভাই ফাওলাল মাঝে মাঝে বাড়ি ছেড়ে দূরে কাজ করতে যায় এবং যার সঙ্গে ডমরুর সম্পর্ক জটিল। কখনো স্নেহের, কখনো সন্দেহের। ফাওলালের বাবা রামুয়া ও ঠাকুমাতুল্য বৃদ্ধা গঙ্গাবুড়িও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। গঙ্গাবুড়ি উপন্যাসের মাঝামাঝি সময়ে মারা যান। ডমরুর জীবনের সবচেয়ে তীব্র আবেগঘন সম্পর্ক তৈরি হয় কসমতীর সঙ্গে। যে অন্য একজনের (বিশরাই

নামক এক ব্যক্তির) সঙ্গে সম্পর্কিত বা বাগদত্তা। কিন্তু ডমরুর মনে তার প্রতি গভীর অস্বীকারযোগ্য আকর্ষণ জন্ম নেয়। পাশাপাশি গোলাবী ও তার বান্ধবী সুরতিয়া—দুই তরুণী যাদের সঙ্গে গ্রামের ছেলেদের রঙ্গ-তামাশা, লাঠিনাচ, হোলি-খেলা ইত্যাদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুহূর্তগুলো জড়িত। উপন্যাসের অন্যতম মর্মান্তিক চরিত্র ফুলমতিয়া—এক তরুণী, যাকে গ্রামের মাতব্বর ও বিচারসভা মিলে 'ডাইনী' আখ্যা দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। যা তার হত্যার পরে ডমরুর মনে গভীর অপরাধবোধ ও যন্ত্রণা তৈরি করে।

আরও আছে ওঝাবাবা—গ্রামের অতিপ্রাকৃত চিকিৎসক, যার কাছে রোগ, ভূত-প্রেত, ডাইনী সন্দেহ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে মানুষ ছোটে। বিজলি যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং যাকেও 'ভূতে পাওয়া' বলে চিকিৎসা করানো হয়। বহিরাগত চরিত্র হিসেবে আসে সুদেশ রায়। যে গ্রামে এসে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করে এবং গ্রামবাসীদের অস্বস্তিতে ফেলে। চুড়িওয়ালা বুড়োও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র—ডমরুর পরিচিত এক প্রবীণ ব্যবসায়ী। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চুড়ি বিক্রি করে এবং ডমরুর পারিবারিক ইতিহাসের কিছু অংশ জানে।

উপন্যাসের শুরুতেই আসে মৃত্যু দৃশ্য। ডমরুর স্ত্রী ফুলি টিলা থেকে পড়ে যায়। ডমরু জঙ্গলের পথ দিয়ে ঘরে ফেরে, আর ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসে মেয়েলি কণ্ঠের আর্তনাদ—শাওনির ডাক। ডমরুর ভৌজি (বৌদি) প্রসবজনিত জটিলতায় মৃত্যুশয্যায়। পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক আর অসহায়ত্ব ছড়িয়ে পড়ে। ওঝাবাবাকে ডেকে আনা হয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু তার প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় এই সমাজে চিকিৎসা মানে মূলত অতিপ্রাকৃত আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র, তেল-সিঁদুর, চাল ছোঁয়ানো ইত্যাদি। ওঝাবাবার নৃশংস, ভীতিজনক শারীরিক বর্ণনা (কালো পাথরের মতো শরীর, জবাফুলের মতো চোখ) তাকে প্রায় অতিপ্রাকৃত এক সত্তায় পরিণত করে। গোবর-লেপা হলুদ্মাখা দাওয়ায় তথা উঠোনে আকোচাল দিয়ে ;দিশা' দেখতে বসে ওঝা। চাল দিয়ে তন্ত্রাচার করে। ওঝার মতে শ্মশানের শয়তানটাই ধরেছে ফুলিকে। ফুলিকে বাঁচানোর জন্য মুরগী, সোয়া কেজি চাল, মদ, হাঁসের বাচ্চা ইত্যাদি দাবি করতে। শেষ পর্যন্ত শাওনির ভৌজি (বৌদি) মারা যান। আর তার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে গভীর শোক। এই অংশেই উপন্যাসের কবরস্থান-কেন্দ্রিক ভূগোলের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর দিকের শ্মশানে টিলাগাঁয়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে কবর দিয়ে আসছে, আর কবর খুঁড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে পুরনো মৃতদের সমাধি থেকে টাকা-পয়সা, গয়না বেরিয়ে আসে। ডমরুর বৌ ফুলিকেও কবর দেওয়া হয়। ফুলির কবরে পয়সা ছড়ায়নি বেশি গ্রাম্বাসীরা। ডমরু রূপোর বাঁক জোড়া দিয়েছে। ডুমুর গাছে অরাল পাখি ডেকে ওঠে। মৃত্যু এদের জীবনকে থামাতে পারে না। লেখকের কথায়-

‘জনম-মরণ, শাদী-নর্তা কোন কিছুই তেমন ঢেউ জাগায় না। জাগলেও দু’চার পলের জন্য। কে গেল, কে এল তার হিসাব, খুশীতে হাসির ঝিলিক, দুখে দু’ফোটা চোখের জল সব কিছুই নোনা-সে তাকত্টাই বা থাকে কোথায়।’

তারা হাসে, কাঁদে আর ‘দনা’ ভরে হাঁড়িয়া খায়। ‘দনা’ কুড়চি পাতা দিয়ে মেয়েরা তৈরি করে ঝাড়ু বা শলা কাঠি দিয়ে গেঁথে। মদ খাওয়ার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে। মাদলের বোলে নাচে। ঝুমুর তাদের প্রাণ। তিনটাঙা গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, দাওধারানি হাটের গুরুত্ব, আর গ্রামবাসীদের জীবিকা—নুন, তেল, সিধা, কেরোসিন, চাল কেনার জন্য হাটের ওপর নির্ভরতা—এসব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। ডমরুর হাঁটাচলা, রাস্তার ধারের জঙ্গল, বৃষ্টিভেজা পথ ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠক প্রবেশ করে এই জনপদের নিত্যকার ছন্দে। এই অধ্যায়েই লক্ষ্মণ নামের বন্ধুর সঙ্গে ডমরুর সাক্ষাৎ হয়। লক্ষ্মণ ওরাং ডমরুর মতো মহাজনের বাড়িতে যাচ্ছে হরি চৌধুরী পাড়ায়। হরির নাতি নরহরি দেববর্মা তাদের মহাজন। বিপদে আপদে ভরসা। ফুলির শ্রাদ্ধের টাকা জোগাড় করতে যাচ্ছে ডমরু। হাঁড়িয়া ছাড়া তাদের কোনো অনুষ্ঠান হয় না। সেজন্য টাকা দরকার। তাদের কথোপকথনে গ্রাম্য রসিকতা, খুনসুটি প্রকাশ পায়। লক্ষণ চরিত্রের মধ্যে ঘৃণ্য পুরুষতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি একজন রহস্যময় মেয়ের সঙ্গে ডমরুর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ ঘটে। ডমরুর মনে জাগে অচেনা কৌতূহল ও আকর্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায় শাওনি ও তরুণীদের জগৎ। এই অংশে শাওনি ও তার বান্ধবীদের—বিশেষত গোলাবী ও সুরতিয়ার সম্পর্ক আরও বিস্তৃতভাবে উঠে আসে। কিশোরী-তরুণীদের খুনসুটি, রসিকতা, প্রণয়-আভাস, আর গ্রাম্য সামাজিক রীতিনীতির চিত্র ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে দেখা যায়, ভাটিখানা (মদের আসর) গ্রাম্য পুরুষদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের সীমান্ত প্রদেশের জঙ্গলি চোরা পথে একসময় অনেক মানুষের সমাগম হত। আসা-যাওয়ার পথে লোকজন শাওনিদের বাড়িতে জিরোত। এ তল্লাটে গুড়ের মদ শুধু শাওনিরাই বানাত। শাওনির প্রতি ডমরুর স্নেহ এবং তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও এই অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়। এ-ছাড়া সদ্য হারানো স্ত্রী ফুলির প্রতি ভালোবাসা, শোক, নস্টালজিয়া ডমরু চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। ফুলির প্রেম, প্রীতি, সোহাগ, স্নেহ সবকিছুই যেন মাটির চুল্লি, পচা গুড় ভরা টিন, টিনের চোঙা, ডেগ, বোতল, গ্লাসে খুঁজে পায় ডমরু। সবকিছুতেই ফুলির হাতের স্পর্শ লেগে আছে।

চতুর্থ অধ্যায় ফাওলালের প্রত্যাবর্তন ও পারিবারিক টানাপোড়েন। ফাওলাল দূর থেকে ফিরে আসে, কিন্তু তার মুখ ভার, কথা কম। তার আচরণে রহস্য আর দূরত্ব প্রকাশ পায়। গঙ্গাবুড়ি (তার ঠাকুমা) তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন, যত্ন করেন। এই অধ্যায়ে গঙ্গাবুড়ির চরিত্র

এবং তার আশ্রয়দাতা ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে—তার বাঁশের মাচা, সাপ-খোপের মধ্যেও নিরাপদ থাকার কৌশল, নাতি-নাতনিদের প্রতি তার স্নেহ। রামুয়ার (ফাগুলালের বাবা) সঙ্গে গঙ্গাবুড়ির সম্পর্কের টানাপোড়েনও এখানে ফুটে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায় খরা ও প্রকৃতির রুক্ষতা বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতির আশ্রয়ে বেঁচে থাকা জনজাতির জীবনে প্রকৃতির ভয়াবতার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। চৈত্র মাসের ভয়াবহ খরার বর্ণনা এই অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু। নদী-জলাশয় শুকিয়ে যাওয়া, মাছ ধরতে না পারা, তীব্র গরমে গ্রামবাসীদের কষ্ট এসব বিস্তারিতভাবে চিত্রিত। শাওনি ও অন্যান্য মেয়েরা দূরের কুয়া থেকে জল আনতে যায়। আর সেই পথেই গোলাবীর সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ছোট ঘটনা ঘটে। ঝগড়া, রসিকতা, সন্দেহ প্রকৃতির বিরূপতায় মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখানো হয়েছে। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা এখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ডমরুর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ফাওলালের প্রতি সন্দেহ। ডমরু ফাওলালের কথা শোনে। ফাওলালের প্রতি ডমরুর জটিল অনুভূতি প্রকাশ পায়। স্নেহ, ঈর্ষা, উদ্বেগ মিলেমিশে যায়। ডমরু নিজের ভেতরের এই দ্বন্দ্ব বুঝতে পারে না ভালোভাবে। এই অধ্যায়ে ডমরুর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ধরা পড়েছে। নিজের প্রতি সন্দেহ, আত্মবিশ্লেষণের প্রবণতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ডমরু একটি তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তার মনে জাগে প্রবল আকর্ষণ ও দ্বিধা। এরসঙ্গেই নিজের কামনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা ধরা পড়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে ফুলমতীকে ডাইনী অপবাদ। উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় ও মর্মান্তিক ঘটনা এই অধ্যায়ে ঘটেছে। ফুলমতীর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মতো। গাঁয়ের সব পোয়াতির আঁতুড় ঘর সামলাতো সে। গ্রামে গুজব ছড়ায় ফুলমতী ডাইনী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে সে মানুষের ক্ষতি করছে, রোগ-শোক ছড়াচ্ছে। গবরার্ মা নাকি স্পষ্ট দেখেছে পুজোর সময় ফুলমতী থুতু ফেলেছে আর সেজন্যই ওঝার পূজো আর বলি ফলেনি। মৃত শিশুটি যখন শেষবারের মতো ককিয়ে উঠেছিল তখন নাকি ফুলমতীর ঘর থেকে মাংস রান্নার গন্ধ আসছিল। কলজে্ ভাজার গন্ধ। গ্রামবাসীরা মনে করে মন্ত্রের জোরে ডাইনী ফুলমতী হৃৎপিণ্ডটা ভেজে খেয়েছে। ফুলমতী ভালোর জন্যই গবরা্ কে বলেছিল ডুলিতে করে স্ত্রীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। অশিক্ষিত, অন্ধবিশ্বাসী গবরা্ এতেও অসন্তুষ্ট হয়। গাঁয়ের বাঢ়কা দেওতার থানে সভা বসেছে। গ্রামের মাতব্বর ও বিচারসভা ডেকে ফুলমতীকে বিচারের নামে অপমান ও নির্যাতন করা হয়। গবরা্ চড় মারে। দু'তিনজন স্ত্রী-লোক আঁচড়ে কামড়ে দেয়। ফাগুলালের বাবা বলে একদিন দুপুর রাতে ফুলমতিয়াকে হেঁটে যেতে দেখেছে। পায়ের পাতা তার পেছনের দিকে

ঘোরানো ছিল। সানতারা মাঝির মতে ফুলমতী বিদ্যে শিখেছে কোনো এক বাগান থেকে। ফুলমতী বাগানে দাদার বাড়িতে গিয়েছিল। তার বৌদি ট্রেনিং নিচ্ছিল সরকারিভাবে সেবা- শুশ্রূষার। ফুলমতী নিজের নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীদের কুসংস্কার আর ভয়ের কাছে তার প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়। সভার শেষে ফুলমতী আর কথা বলে না। অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করে না। শাস্তি হিসাবে ওকে মল খাওয়ানোর দাবি ওঠে। মল খাওয়ালে নাকি মন্ত্র-তন্ত্র কাজ করে না। লক্ষণের মতো মানুষেরাও মল খাওয়াতে যায়। এই অধ্যায়ে ডাইনী-অপবাদের সামাজিক প্রক্রিয়া গুজব, ভয়, প্রতিহিংসা, ক্ষমতার রাজনীতি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। ডমরুর মনেও এই ঘটনা গভীর আলোড়ন তোলে। কারণ ফুলমতীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্মৃতি জড়িত। ফুলিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছি অথচ কেউ সেটা শোনেনি। ফাগুলার শেষে বাধা দেয়। শাওনিও মিনতি জানায়। গবর‍্যার মৃত সন্তান তখনও ঘরে। তার ক্রোধ কমে না। এদিকে এই অংশের উঠে আসে অরাল পাখির কথা। অরাল পাখির ডাকে বিষণ্ণতা, ভয় নামে টিনটাঙার সমাজে। গাঁয়ের মানুষ জানে আর মানে যে অরাল ডাকার অর্থ মৃত্যু কিংবা খারাপ খবরের পূর্বাভাস। শেষ অব্দি ডমরু হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ফুলমতীর চোকগ দুটি ডাইনীর নয়।

শাওনি, সুরতিয়া, গোলাবী, লক্ষ্মণ প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে রঙ খেলা, হাসি-রসিকতা, প্রণয়ঘটিত টানাপোড়েন প্রকাশ পায়। পাহাড়ি পথে বুকে ভয় নিয়ে চলে। কচুবিল, লক্ষ্মীছড়ার মতো পাহাড়ি ঝর্ণার প্রসঙ্গ এসেছে। দিকু সম্প্রদায়ের সূরজলালকে ‘ধলাকিষণ’ বলে ডাকে। রয়েছে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পদের উল্লেখ- ‘মন উচাটন রাই কিশোরী- ভজে দিবানিশি নাম শ্যামহরি’। দিকু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্কের টানাপোড়েনও এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। লেখকের কথায়-

> “ওদের এ গাঁয়ে বেজাতের ‘দিকু’দের ভাব ভালবাসার অধিকার দেয়া হয় না। সেই দেশে থাকতে এরা নাকি ছিল রক্তচোষা। সাঁওতাল-মুণ্ডা, -ওরাং মাঝি-দের শত্রু। ‘দিকু’ মানেই বহিরাগত। যারা বাইরে থেকে এসে ওদের জঙ্গল দেশে, মুক্ত জীবনে ঢুকেছে, ওদের স্বাধীনতা, স-ব কেড়ে নিয়েছে।”

এখানে অবিশ্বাস, শোষণের স্মৃতি, আর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটেছে। শাওনির মন দিকু সূরজলালে মজেছে। ভালোলাগার মধ্যে জাতপাত, বিদ্বেষের উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, সংশয় দেখা দিয়েছে। তবুও প্রেম, রসিকতায় ভাটা পড়ে না।

(বি:দ্র- ক্লাস নোটের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ রইল- এর সঙ্গে নিজের পাঠ ও বিশ্লেষণ যুক্ত করবে।)